

তালুক

ফতেমোল্লা

নারায়ণগঞ্জ।

21শে ফেব্রুয়ারী, 1952 সাল।

ফুঁসে ফুঁসে উঠছে শীতলক্ষ্যার ঢেউ। অগ্নিগর্ভ অগ্নিগিরির মতো সুজলা সুফলা দেশটা বিস্ফোরণ উনুখ হয়ে আছে। একটা ত্রৈলোক্য আর ক্ষোভের ঢেউ ছেয়ে দিয়েছে সারাটা দেশ। পাঁচটা বছরও গেল না পাকিস্তান হবার পর। অথচ 1946 সালে পাকিস্তান প্রশ্নের ভোটাভুটিতে পাঞ্জাবে সেকান্দর হায়াত খানের ইউনিয়নিষ্ট পার্টির কাছে পাতাই পায়নি মুসলিম লীগ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সর্দার বাহাদুর খানের লাল কোর্তা পার্টির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। শুধুমাত্র সিন্ধুতে জিতেছে, তাও নমঃ নমঃ করে মাত্র এক সদস্যের মেজরিটিতে। আর বাংলায় ? প্রতি একশ' জনের মধ্যে পঁচানব্বই জনের অভূতপূর্ব ভোটে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের দাবী। জন্ম হয়েছিল নতুন এক রাষ্ট্রের। পৃথিবীর সভায় স্থান পেয়েছিল সাদা-সবুজের চাঁদ-তারা আঁকা এক নতুন গর্বিত পতাকা।

সেই অবদানের এই পরিণাম ! সারাদেশের শতকরা 56ভাগ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষাকে, নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত বাংলাভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নয়, অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিতেও এত আপত্তি ! এতই আপত্তি যে তার জন্য বরকত, জব্বার, সালাহউদ্দীন, শফিউর রহমান, আঃস সালামের মত ছাত্রকে, ব্যবসায়ীকে, চাকুরিজীবী এবং রিক্সাচালকের মত সাধারণ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা যায় !

ঝড় উঠেছে সারাদেশে। যে মুহূর্তে শহীদের রক্ত স্পর্শ করেছে মাটি, বিদ্রোহ চারিদিকে। বিদ্রোহ আজ নারায়ণগঞ্জেও। প্লাবনের মত পথে নেমে এসেছে জনতা। দিনে রাতে বিরামহীন চলছে মিছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত আকাশ বাতাস। ছাত্র মজুর কৃষক ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী শিক্ষক, দশ থেকে সত্তর বছর বয়সের পুরুষ মহিলা কে নেই সেখানে ! এতবড় একটা আন্দোলন, কিন্তু কোথাও কোন হিংস্রতা নেই। জ্বালানো পোড়ানো নেই। এমনি শক্ত হাতে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন ডঃ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু নন), শামসুজ্জোহা, সফি হোসেন খান আর...

আর ? স্তম্ভিত বিস্ময়ে নারায়ণগঞ্জবাসী দেখল তাদের এত বছরের চেনা, এত পরিচিত মমতাজ বেগমকে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। মর্গান গার্লস হাই স্কুলের চিরপরিচিতা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর হাতে আজ বই-পুস্তকের বদলে উড়ছে বিদ্রোহের পতাকা। কেতাবী শিক্ষা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জীবনের অন্য এক ব্রত শেখাবার জন্য পথে নেমেছেন শিক্ষয়িত্রী। যেমন নেমেছিলেন লিবিয়ার ওমর মুখতার তাঁর গাছতলার মাদ্রাসা পেছনে ফেলে, আশি বছর বয়সে। মিছিলে, শ্লোগানে, বিদ্রোহে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছেন মমতাজ বেগম, সমস্ত নারায়ণগঞ্জের উত্তাল বন্যা তাঁর পেছনে। প্রমাদ গুনলেন পাকিস্তানী এস.ডি.ও. ইমতিয়াজী। 29শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে প্রেস্তার করে আনা হল থানায়। ক্ষোভে দুঃখে নারায়ণগঞ্জ তখন

উন্মত্তপ্রায়। জামিন আনা হল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু জামিন পাওয়া গেল না। পরদিন কোর্টে নগদ দশ হাজার টাকার জামিন এলো (৫২ সালের দশ হাজার)। তা-ও নাকচ হলো। হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার চাপে কোর্ট তখন পর্য্যুদস্য। পুলিশের ভ্যানে মমতাজ বেগমকে ঢাকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। বাধা দিলো জনতা। আবার সেই লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাসের পুরনো কাহিনী। নিরস্ত্র ছত্রভঙ্গ জনতা এবার বন্ধ করে দিলো চাষাড়া রেলট্রাসিং-এর রেলগেট। আরেক দফা সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস। জনতাও তখন মরিয়া। চাষাড়া থেকে পাগলা পর্য্যন্ত ছ'মাইল রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ততক্ষণে কেটে ফেলে রেখেছে দশ-বিশ-পঞ্চাশটা নয়, একশো-ষাটটা বড় বড় গাছ। নিরস্ত্র জনতার প্রতিরোধ। নেত্রীর প্রতি সাধারণ 'অশিক্ষিত' দেশবাসীর বুকভরা ভালবাসার উপটোকন। পুলিশ ভ্যানে বসে সব দেখছেন মমতাজ বেগম। কি ভাবছেন কে জানে !

সংঘর্ষে আহত হয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন ইন্সপেক্টর দেলোয়ার হোসেন। এবং তখনি আশেপাশের গ্রাম থেকে বন্য়ার মতো ছুটে এলো গ্রামবাসীরা। জনতার কাগাগারে পুলিশ বন্দী হয়ে বসে রইলো। ডাক পড়লো ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে স্বরণাভীতকালের প্রথম কারফিউ জারী হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১৫ জনকে, দু'জন ছাত্রীসহ। এতবড় সংঘর্ষে পুলিশ একবারও গুলিবর্ষণ করেনি। সম্ভবত ইমতিয়াজীর নির্দেশ ছিল এটা।

পরদিন ঢাকার থানায় অন্য নাটক। মুক্তি চাই ? আমরাও তো তোমাকে ছেড়ে দিতেই চাই। এই কাগজটায় একটা সই করে দাও। এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি। কিসের কাগজ ওটা ? ওটা হলো মুচলেকা। 'যাহা কিছু করিয়াছি, ভুল করিয়াছি, আর কদাপি করিব না।' ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন মমতাজ বেগম। মুশকিলে পড়লেন পুলিশ কর্তারা। একে মহিলা, তার ওপর আবার শিক্ষয়িত্রী। শেষে একটা কেলেকারী হয়ে না যায়। পুলিশ গিয়ে পড়লেন মমতাজ বেগমের স্বামীর কাছে। ঘরের বৌ থানা হাজতে আছে কদিন থেকে, একি ভালো কথা ? একটু বুঝিয়ে দেখ না ! তাই তো ! টনক নড়লো স্বামীপ্রবরের। ছুটে এলেন থানায়। যা হবার হয়েছে, এখন কাগজটায় সই করে ঘরে ফিরে চলো। হতবাক হয়ে গেলেন মমতাজ বেগম। পঞ্চাশ দশকের বাংলায় রক্ষণশীল সমাজের সম্মানিতা শিক্ষয়িত্রী হয়ে তিনি রাস্তায় নেমেছেন। থানা হাজতে আটক আছেন দিনের পর দিন শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। আগ্রাসন থেকে প্রিয় মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য। সহযোগিতা আর উৎসাহ তো তাঁর দরকার স্বামীর কাছ থেকেই সর্বপ্রথম। তার বদলে এই !

ক্ষেপে উঠলেন স্বামীপ্রবর। এত বড় আন্দোলন। হতছাড়া মেয়েমানুষ কথা শোনে না দেখি ! এক্ষুণি করে দাও সই, নইলে বের করে দেব বাড়ী থেকে। তালাক দিয়ে দেব ! কিন্তু তাই কি হয় ! জননী জন্মভূমি একবার যাকে ডাকে, 'সে অনাদি ধ্বনি' যে একবার শুনতে পায় তার পথ বড় বন্ধুর। স্বাভাবিক আরামের পুরনো জীবনে কখনো ফিরে আসতে পারে না সে। পারলেন না মমতাজ বেগমও। হয়ে গেল তালাক। নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের ব্রহ্মাণ্ড।

যুগ বদলে গেছে। একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলাদেশ হয়েছে। ইতিহাস থেকে, দলিল থেকে মুছে গেছেন মমতাজ বেগম। মুছে গেছেন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রতিষ্ঠা থেকে, স্বামী-সন্তানের মাধুর্যময় পারিবারিক জীবন থেকে। হয়তোবা জীবন থেকেও। আমরা কেউ তাঁকে মনে রাখিনি। মর্গান গার্লস হাই স্কুল নারায়ণগঞ্জে আজও আছে। নেই শুধু এক অসাধারণ

শিক্ষয়িত্রী। দেশের জন্য, মাতৃভাষার জন্য যিনি ধ্বংসের করাল গর্জন শুনছিলেন সঙ্গীতের মতো।

আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে একুশে ফেব্রুয়ারী। আবার অনুষ্ঠান হবে দেশে বিদেশে। আবার গাওয়া হবে ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো’। আবার বক্তারা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলবেন সেই অবিস্মরণীয় নামগুলোর কথা (বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, সালাহউদ্দীন...

(এক মিনিট, এক মিনিট ! কি নাম বললেন ? সালাহউদ্দীন ?

(হ্যাঁ, একুশের অমর শহীদ। কেন ?

(ও আঁচ্ছা ! তা, কবে কোথায় শহীদ হয়েছিলেন জনাব সালাহউদ্দীন ?

(কেন, একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে। বেলা চারটার দিকে ! কেন মনে নেই, ঐ যে মাথায় গুলি লেগে যার মগজ বের হয়ে পড়েছিল লাশের দু’ফুট দূরে ?

(ও, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাশের ছাত্র। খুলিহীন লাশের ছবিও ছাপা হয়েছিল পরে ইত্তেফাকে। তাই না ?

(তা তো বটেই।

(কিন্তু তাহলে এম.এ. ক্লাশের ঐ সালাহউদ্দীনটি কে, যিনি পরে সশরীরে এসে সবাইকে বলেছিলেন যে খামোখা তাঁর শহীদ হবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে ?

(হো-হোয়াট ???

(হ্যাঁ, তাই তো ! জিজ্ঞেস করুন না গিয়ে বাংলা অ্যাকাডেমীর লাইব্রেরিয়ান রাজ্জাক সাহেবকে।

(কিন্তু, কিন্তু, খুলি উড়ে যাওয়া লাশ ...

(ওরকম লাশ তো ছিল মাত্র একটা। এ বিষয়ে কোন বিতর্কও নেই। সেটাই ছিল রফিকের, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র, বাদামতলীর কমার্শিয়াল আর্ট প্রেসের মালিক ওর বাবা। লাশটা ওদিনই সন্ধ্যায় সনাক্ত করেছেন তাঁর ভগ্নিপতি মোবারক আলী।

(কিন্তু বদরুদ্দীন ওমরের বই, অলি আহাদ, আখতার মুকুলের বই

(হতেই পারে। স্মৃতিচারণায় দু’তিন যুগ পরে ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু ছবি তো আরে মিথ্যে বলবে না ! খুলি উড়ে যাওয়া একমাত্র লাশটার ছবি ছিল মেডিক্যাল কলেজের

আঠারো শেডের দশ নং রুমের হুমায়ুন কবির হাই, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার আমানুল হক, আন্দোলনের নেতা আহমেদ রফিক, সবার কাছেই। পরিবর্তীকালে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুলি উড়ে যাওয়া একমাত্র লাশটা রফিকেরই ছিল। অন্যান্য যাদের নাম জানা যায় সবারই শেষ মুহূর্তের নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। নেই শুধু সালাহউদ্দীনের। আর সেই সাথে অবশ্য আরো অনেক শহীদের নামই জানা নেই।

(ধুস্শালা, এ যে ভারী একটা গ্যাড়াকল হলো দেখছি। চুয়াল্লিশ বছর ধরে দেশে বিদেশে এত অনুষ্ঠান এত স্ক্রিপ্ট, এত বক্তৃতার সালাহউদ্দীন, এ হ্যাপা এখন সামলায় কে ?

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আতুল মতিন, এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় আহমদ রফিক (তৎকালীন ছাত্রনেতা), এঁদের লেখা দলিলভিত্তিক গবেষণার বই ‘ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য’ পড়ে দেখবার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করছি।

25 শে ফেব্রুয়ারী 1952 সাল।

চোখ কপালে উঠে গেল ঢাকার সরকারী সন্মট মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী সাহেবের। বদরাগী বলে পরিচিত, মাত্র 18ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে ফরিদপুর থেকে ঢাকায় এনেছেন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, ঢাকার ভাটাইল সিচুয়েশন কন্ট্রোল করবার জন্য। তা ভালোই কন্ট্রোল করেছেন তিনি। একুশে থেকে শুধু গুলি আর গুলি। ছাত্ররা যখন মোটামুটি শায়েস্টা হয়ে এসেছে তখন দেখা যাচ্ছে সারা দেশ জুড়ে প্রায় সবকিছুই বন্ধ। রেলের চাকা প্রায় বন্ধ, বাস ট্রাক তো একেবারেই বন্ধ। তাই পরিবহন সমিতির লোকদের নিয়ে সভায় বসে প্রচুর হুঙ্কার ও ধমকে প্রায় সফল হয়ে এসেছিলেন, তখন এই মতি মিয়া বলে কি !

(যা পারেন করেন গা। নিজদেশে পরাধীন হইছি আমরা। চলব না বাস ট্রাক।

সভার সবচেয়ে অশিক্ষিত লোকটা যেন সবার সামনে চড় বসিয়ে দিল বাংলা জানা পাকিস্তানী সন্মটের গালে। ক্ষেপে উঠলেন।

(মানেটা কি ? নিজদেশে পরাধীন মানে কি ?

(মানে বুইঝা লন।

যেন আরেকটা চড় এসে পড়ল শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ পদে বসা লোকটার গালে। স্মৃতিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ততক্ষণে সভার হাওয়া ঘুরে গেছে। ক'ঘন্টা পর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হলো।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল।

মহাকালের ত্রাণশীলগ্নে এসে দুলছে বাংলার ইতিহাস। টু বি অর নট টু বি, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। ৯৪ নবাবপুর রোডে বসেছে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা। আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিল করতে দেবে না নুরুল আমিন সরকার। ১৪৪ধারা জারী হয়েছে। সে নির্দেশ কি মেনে নেয়া হবে, নাকি মিছিল হবে। চলছে আলোচনা, বক্তৃতা। নানারকম বাক্য-চাতুরীতে পানি ঘোলা করে সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসছে সংগ্রাম পরিষদ। মনসা পঞ্জায় সাপ তাড়ানোই ভাল। লাঠালাঠির মধ্যে আমরা নেই। রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহের সাঁওতাল, নানকার ও হাজং বিদ্রোহে সরকারের চণ্ডমূর্তি তো আগেই দেখা গেছে। সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাকে মাত্র সেদিন দেশের বাইরে ছুড়ে ফেলেছে। ফজলুল হকের মতো 'শেরে বাঙ্গাল'কে আছাড় মেরেছে। এ হেন উন্মাদ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা দেন-দরবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভাল। দেশপ্রেমের জন্য পুলিশের ডাঙা খেতে চাই না বাপু। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দেখছ না, ঢাকার এতকালের বাঙ্গালী ম্যাজিস্ট্রেট বর্ষিয়ান হায়দার সাহেবকে সরিয়ে ফরিদপুর থেকে বদরাগী কোরেশী সাহেবকে মাত্র পরশুদিন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট করা হলো। কে জানে ওর মনে কি আছে। তাই আগামীকালের ১৪৪ধারা আমরা লক্ষ্মীছেলের মতো মেনে নেব। আমরা মানে পার্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, তমুদ্দুন মজলিশ, এরা। মেজরিটা ভোট পাশ হয়ে গেল নতজানু সিদ্ধান্ত। মিছিল হবে না।

'না ! এ সিদ্ধান্ত আমরা মানি না।' অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল যুবলীগের অলি আহাদ, ফজলুল হক হলের আর মেডিকাল কলেজের সংসদের ভিপি যথাক্রমে শামসুল আলম ও গোলাম মওলা, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আতুল মতিন। মেজরিটা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে এবং ইতিহাসের পক্ষে অমোঘ উল্লেখ করে গেল 'একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙ্গে দুশো চুয়াল্লিশ খণ্ডে পরিণত হবে। কাল নয়, আজই।' ততক্ষণে বিশ পেরিয়ে একুশের আগ্নেয়ায় পা রেখেছে ঘড়ি। স্মৃতিত মেজরিটার চোখের সামনে চারটে অগ্নিকণা মাঝরাতের অন্ধকারে রওয়ানা হয়ে গেল আলোকিত সার্ব্যের সন্ধানে। সুদূর ভবিষ্যতে একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ আর ষোলই ডিসেম্বরের চোখে তখন ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি। আর ভয় নেই।

ইতিহাস এভাবেই তৈরী হয়। মুক্তিপথের হে অগ্রদূত ! কন্টকপথের হে তীর্থযাত্রী ! তোমাদের শতকোটি সালাম।

Courtesy : NYbangla.com